بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ মার্চ, ২০২১ মোতাবেক ১২ আমান, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। হযরত উসমান (রা.) মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে জীবনের শেষ হজ্জ করেছিলেন যখন নৈরাজ্য চরম রূপ ধারণ করেছিল। যাহোক, তাঁর শেষ হজ্জের সময় নৈরাজ্যবাদীরা মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করেছিল আর হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হজ্জ থেকে ফেরার পথে হযরত মুআবিয়া (রা.)'ও হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে মদিনায় আসেন। কিছুদিন অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করেন, নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি এ সম্পর্কে কিছু নিবেদন করতে চাই, হযরত উসমান (রা.) বলেন, বলুন। তখন তিনি বলেন, আমার প্রথম পরামর্শ হলো, আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন; কেননা সিরিয়াতে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিরাজমান আর কোন ধরনের নৈরাজ্য নেই। এমন যেন না হয় যে, হঠাৎ কোন নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিবে আর তখন (এ থেকে উত্তরণের) কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে তাকে বলেন, আমার শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললেও আমি মহানবী (সা.)-এর নৈকট্য কোনক্রমেই পরিত্যাগ করতে পারব না। হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, তাহলে দ্বিতীয় পরামর্শ হলো, আপনি আমাকে একটি সিরিয়ান সৈন্যদল আপনার নিরাপত্তার খাতিরে প্রেরণ করার অনুমতি দিন। তাদের উপস্থিতিতে কেউ দুষ্কৃতি করতে পারবে না। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, উসমানের নিজ প্রাণের নিরাপত্তার খাতিরে বাইতুল মালের ওপর এত বড় বোঝা আমি চাপাতে পারি না আর সেনাদল নিয়োগ করে মদিনাবাসীদের কষ্টে নিপতিত করাও পছন্দ করি না। তখন হযরত মুআবিয়া (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে তৃতীয় পরামর্শ হলো, সাহাবীরা যদি উপস্থিত থাকে তাহলে এরা হযরত উসমান (রা.)-এর অবর্তমানে সাহাবীদের মধ্য হতে কাউকে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়ার সাহস পাবে। তাই, তাদেরকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিন। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) যাদেরকে একত্রিত করেছেন আমি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত বা ছত্রভঙ্গ করে দিব– তা কীভাবে সম্ভব? একথা শুনে হযরত মুআবিয়া (রা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং নিবেদন করেন, আমি আপনার নিরাপত্তার খাতিরে যেসব প্রস্তাব বা পরামর্শ দিয়েছি এর মধ্য হতে আপনি যদি একটিও গ্রহণ না করেন তাহলে কমপক্ষে জনসমক্ষে এ ঘোষণা করে দিন যে, যদি আমার প্রাণের কোন ক্ষতি হয় তাহলে মুআবিয়ার অধিকার থাকবে আমার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করার। হতে পারে, মানুষ এতে ভয় পেয়ে দুষ্কৃতি করা থেকে বিরত থাকবে। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, মুআবিয়া! যা হওয়ার তা হবেই, আমি এমনটি করতে পারব না, কেননা আপনার প্রকৃতি কঠোর; পাছে এমন না হয় যে, আপনি মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন। তখন হযরত মুআবিয়া কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছ থেকে উঠে আসেন আর বলেন, আমি মনে করি– সম্ভবত এটিই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। বাইরে বেরিয়ে এসে সাহাবীদের তিনি বলেন, ইসলামের উন্নতি আপনাদেরকে কেন্দ্র করে। হযরত উসমান

(রা.) এখন একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন আর নৈরাজ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনারা তাঁর খেয়াল রাখবেন– একথা বলে মুআবিয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর যে দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা ছিল সে সম্পর্কে মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা.) তাঁর ঘর থেকে উঁকি মেরে অবরোধকারীদের বলেন, 'হে আমার জাতি! আমাকে হত্যা করো না, কেননা আমি যুগের হাকেম বা ইমাম এবং তোমাদের মুসলমান ভাই। খোদার কসম, আমার অবস্থান সঠিক হোক বা ভুল, আমি সর্বদা সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। স্মরণ রেখো, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তোমরা কখনো একত্রে নামায আদায় করতে পারবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদও করতে পারবে না, আর গনিমতের সম্পদও তোমরা ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, অবরোধকারীরা একথা মানতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময়, যখন সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিলে এবং সবাই ধর্ম ও সত্যপথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে, খিলাফত সম্পর্কে কি সেই দোয়া কর নি, যা তোমরা করেছিলে? তবে কি তোমরা এখন একথা বলতে চাইছ যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের দোয়া কবুল করেন নি। নাকি একথা বলতে চাইছ যে, এখন আর আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের কোন পরোয়া নেই। নাকি একথা বলতে চাইছ যে, আমি এটি তথা খিলাফতকে তরবারির জোরে বা জোরপূর্বক করায়ত্ত করেছি, মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে এটি অর্জন করি নি! নাকি তোমরা মনে করছ যে, আমার খিলাফতকালের প্রাথমিক যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমার সম্পর্কে সেসব বিষয় অবগত ছিলেন না যা পরবর্তীতে জানতে পেরেছেন। তা সম্ভব নয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা সবই জানেন। এসব কথা সত্ত্বেও যখন অবরোধকারীরা তাঁর কথা মানে নি তখন তিনি (রা.) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে ভালোভাবে গুণে রাখ আর এদের সবাইকে বেছে বেছে ধ্বংস করো আর এদের কাউকেই ছেড়ো না। মুজাহেদ বলেন, এই নৈরাজ্যে যারাই অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আবু লায়লা কিন্দী বর্ণনা করেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখেছি, তিনি একটি ঘুলঘুলির আড়াল থেকে উকি মেরে বলেন, হে লোকসকল! আমাকে হত্যা করো না আর আমার যদি কোন অপরাধ থেকে থাকে তাহলে আমাকে তওবার সুযোগ দাও। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তোমরা কখনোই একত্রে নামায পড়তে পারবে না আর কখনোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে না। আর তোমরা অবশ্যই পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে বলেন, তোমরা এভাবে বিবাদবিসংবাদে জড়িয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বলেন,

وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ (সূরা হূদ: ৯০)

অর্থাৎ, আর হে আমার জাতি! আমার সাথে শত্রুতা যেন কখনো তোমাদের এমন কাজে প্ররোচিত না করে যার ফলে তোমাদের ওপরও তেমনই বিপদ আপতিত হবে যেমনটি নূহের জাতি, হুদের জাতি এবং সালেহ্‌র জাতির ওপর আপতিত হয়েছিল আর লুতের জাতি তোমাদের যুগ থেকে বেশি দূরের নয়। হযরত উসমান (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, আপনার মতামত কী? এই যে এতকিছু হচ্ছে, এ বিষয়ে আপনার মতামত কী? এর উত্তরে হযরত উসমান (রা.) বলেন যে, যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ এড়িয়ে চল, কেননা এটি তোমাদের সপক্ষে দলিল হিসাবে অধিকতর দৃঢ় হবে। মুহাম্মদ বিন সীরীন বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী হযরত উসমানের সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এই আনসাররা দরজায় উপস্থিত

রয়েছে আর বলছে যে, আপনি যদি সম্মত থাকেন তাহলে আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র আনসার হবার জন্য প্রস্তুত আছি। একথা শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, না, মোটেও যুদ্ধ করবে না। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, 'ইয়াওমুদ্ দ্বার' তথা অবরোধের দিন আমি হযরত উসমান (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, হে আমীরুল মোমেনীন! এখন তো তরবারি ধারণ করাই সমুচিত। তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কি পছন্দ করবে যে, তুমি আমাকে সহ অন্য সবাইকে হত্যা করে ফেলবে? আমি বললাম, না। এতে তিনি বলেন, খোদার কসম, তুমি যদি একজনকেও হত্যা কর তাহলে প্রকারান্তরে সবাইকেই হত্যা করলে। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, একথা শুনে আমি ফিরে আসি এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি নি। প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছিলেন, আজই যুদ্ধ করার সুর্বণ সুযোগ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, আমি অবরোধের দিন হযরত উসমান (রা.)-এর সকাশে নিবেদন করি, হে আমীরুল মুমিনীন! এই নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করুন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বৈধ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের সাথে কখনোই যুদ্ধ করব না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা তার (রা.) গৃহে ঢুকে যায়, তখন তিনি (রা.) রোযাদার ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তার গৃহের সদর দরজায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করতে চায়, তার উচিত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়রের আনুগত্য করা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করি, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার গৃহে আপনার সুরক্ষার জন্য নিশ্চয় একটি দল রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সাহয্যপুষ্ট এবং অবরোধকারীদের তুলনায় সংখ্যায় কম। সুতরাং আপনি আমাকে এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করুন। এটি শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, অথবা বলেন, তোমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে নসীহত করছি, কোন ব্যক্তি যেন আমার জন্য নিজের রক্ত প্রবাহিত না করে অথবা আমার জন্য অন্য কারো রক্ত না ঝরায়। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত-পূর্ব নৈরাজ্য এবং তার (রা.) শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

বিদ্রেহীরা যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে জয়লাভ করেছিল, তারা শেষ চেষ্টা হিসেবে পুনরায় এক ব্যক্তিকে হযরত উসমানের নিকট প্রেরণ করে যেন তিনি খিলাফতের আসন থেকে সরে দাঁড়ান, কেননা তাদের ধারণা ছিল, তিনি (রা.) যদি নিজে খিলাফতের আসন থেকে সরে দাঁড়ান, তবে মুসলমানরা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ বিদ্রোহীদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ মুসলমানদের থাকবে না। হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট যখন বার্তাবাহক আসে তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি অজ্ঞতার যুগেও পাপ থেকে দূরে ছিলাম এবং ইসলাম গ্রহণের পরও কখনো ইসলামি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিনি। যে পদমর্যাদা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাকে দান করেছেন, আমি কেন আর কোন্ অপরাধে সেই পদ ছেড়ে দিব? যে জামা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পরিয়েছেন তা আমি কখনোই খুলব না। সেই বার্তাবাহক এই উত্তর শুনে ফিরে আসে এবং নিজ সঙ্গীসাথিদের সম্বোধন করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত। খোদার কসম, মুসলমানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে উসমানকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। কারণ, তাকে হত্যা করলে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন জবাবদিহি করার কেউ থাকবে না– এসব সত্ত্বেও তাকে (রা.) হত্যা করা কোনভাবেই বৈধ নয়। অর্থাৎ আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় এটি হলেও তাকে হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। উক্ত ব্যক্তির এ কথাগুলি শুধুমাত্র তাদের আতঙ্কেরই প্রমাণ বহন করে না, বরং এই

কথারও সাক্ষ্য বহন করছিল যে, হযরত উসমান (রা.) তখন পর্যন্ত কোন এমন বিষয় সৃষ্টি হতে দেন নি যেটিকে তারা কোন অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তাদের হৃদয় অনুভব করছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। যখন তারা হযরত উসমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম, যিনি অবিশ্বাসের যুগেও নিজ জাতিতে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং যাকে ইহুদিরা নিজেদের নেতা ও অতুলনীয় এক আলেম জ্ঞান করত; তিনি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া আরম্ভ করেন। তিনি তাদেরকে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করতে বারণ করেন। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা নির্বোধের মতো আল্লাহ্ তা'লার তরবারি নিজেদের ওপর টেনে এনো না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যদি তরবারিকে আমন্ত্রণ জানাও, তবে এই তরবারি কখনো খাপে ঢুকানোর সুযোগ পাবে না। তখন মুসলমানদের মাঝে তরবারি নগ্নই থাকবে এবং মুসলমানদের মাঝে সবসময় মারামারি-হানাহানি লেগেই থাকবে। কিছুটা বিবেক খাটাও, এখন শাসন শুধুমাত্র চাবুকের মাধ্যমে করা হয়। অর্থাৎ সাধারণত, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘনে চাবুকের শাস্তি প্রদান করা হয়। তোমরা যদি এই ব্যক্তিকে অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা কর, তবে তরবারি ছাড়া শাসনব্যবস্থা চলবে না। অর্থাৎ তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ অপরাধের শাস্তি হিসেবেও অপরাধীদের হত্যা করা হবে। স্মরণ রেখ, এখন মদিনার সুরক্ষায় ফেরেশতারা নিয়োজিত রয়েছে। যদি তোমরা তাকে হত্যা কর, তাহলে ফেরেশতারা মদিনা ছেড়ে চলে যাবে। এ নসীহতকে তারা যেভাবে ব্যবহার করেছে তা হলো, মহানবী (সা.)-এর সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)-কে তারা তিরস্কার করে বিতাড়িত করে এবং তাকে তার পূর্বের ধর্মের খোটা দিয়ে বলে, হে ইহুদির সন্তান! এসব কাজের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? পরিতাপ! একথা তাদের ঠিকই মনে ছিল যে, আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) ইহুদির ছেলে ছিলেন। কিন্তু তারা এটি ভুলে গেছে যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর হাতে ঈমান আনয়ন করেছেন এবং তার ঈমান আনার ফলে তিনি (সা.) অনেক আনন্দিত হন। তিনি প্রতিটি বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টে মহানবী (সা.)-এর অংশীদার ছিলেন। অনুরূপভাবে তারা একথাও ভুলে গেছে যে, তাদের নেতা ও প্ররোচক, হযরত আলী (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর 'ওসী' আখ্যা দিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর মুখোমুখি দঁণ্ডায়মানকারী ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন সাবাও ইহুদির সন্তান ছিল, বরং সে নিজে ইহুদি-ই ছিল আর শুধুমাত্র বাহ্যত মুসলমান হওয়ার ভান করছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) এসব কথা শুনে নিরাশ হয়ে তাদের কাছ থেকে চলে যান। অপরদিকে তারা যখন দেখে, দ্বারপথে গিয়ে হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করা কঠিন কাজ, কেননা এদিকে অল্প সংখ্যক লোক যারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তারা মরতে বা মারতে সদা প্রস্তুত ছিলেন, তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয়, কোন প্রতিবেশীর দেয়াল টপকে গিয়ে হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করতে হবে। অতএব এই কুমতলব নিয়ে অল্প কয়েকজন লোক এক প্রতিবেশীর দেয়াল টপকে তাঁর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে। তারা যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন হযরত উসমান (রা.) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। অবরুদ্ধ হওয়ার পর দিনরাত তাঁর ব্যস্ততা এটিই ছিল। অর্থাৎ তিনি হয় নামায পড়তেন, নয়তো পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর এছাড়া অন্য কোন কাজের প্রতিই তিনি মনোযোগ দিতেন না। সেই দিনগুলোতে তিনি কেবল একটিমাত্র কাজই করেছেন আর তা হলো এসব লোকের ঘরে প্রবেশের পূর্বে দুজন লোককে তিনি (রা.) ধনভাণ্ডারের সুরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কেননা, যেভাবে এটি প্রমাণিত যে, সেদিন রাতে তিনি মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি (সা.) বলছেন, উসমান! আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার সাথে রোযা খুলবে। এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আজ আমি শহীদ হয়ে যাব। তাই তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করে দুজন লোককে আদেশ দেন যেন তারা ধনভাণ্ডারের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রহরা দেয়,

যাতে হট্টোগোলের মাঝে কেউ ধনভাণ্ডার লুটে নেয়ার চেষ্টা না করে। মোটকথা, ভেতরে প্রবেশের পর তারা দেখে যে, হযরত উসমান (রা.) কুরআন শরীফ পড়ছেন। এসব আক্রমণকারীদের মাঝে মুহাম্মদ বিন আবি বকরও ছিলেন আর তাদের ওপর বিদ্যমান তার প্রভাব ও ক্ষমতার কারণে তিনি একে নিজের দায়িত্ব জ্ঞান করতেন। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন, আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হওয়ার সুবাদে আমি শ্রেষ্ঠত্ব রাখি, তাই আমার আবশ্যিক দায়িত্ব হলো সকল কাজে এগিয়ে থাকা। অতএব তিনি এগিয়ে গিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর দাড়ি ধরে হেঁচকা টান দেন। তার এহেন কাণ্ডে হযরত উসমান (রা.) শুধু এতটুকু বলেন যে, হে আমার ভাইয়ের পুত্র! এখন যদি তোমার পিতা, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) জীবিত থাকতেন তাহলে তুমি কখনোই এমনটি করতে না। তোমার কী হয়েছে? তুমি কি খোদার জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট? আমার প্রতি কি তোমার এছাড়া অন্য কোন রাগ রয়েছে যে, তোমাকে দিয়ে আমি খোদার প্রাপ্য প্রদান করিয়েছি? আমি কেবল এটিই বলি যে, খোদার প্রাপ্য প্রদান কর। একথা শুনে মুহাম্মদ বিন আবু বকর লজ্জিত হয়ে ফিরে যান, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সেখানেই অবস্থান করে। এছাড়া যেহেতু সে রাতেই বসরার সেনাবাহিনীর মদিনায় পৌঁছানোর নিশ্চিত সংবাদ এসে গিয়েছিল আর এ সুযোগই তাদের শেষ সুযোগ ছিল, তাই তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল যে, আমরা আমাদের কার্য সমাধা না করে ফিরে যাব না। অতএব তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে লোহার একটি রড দিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর মাথায় আঘাত করে এবং হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে যে কুরআন শরীফটি খোলা ছিল সেটিকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফলে কুরআন শরীফটি গড়িয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে এসে যায় আর তাঁর মাথা থেকে রক্তের ফোটাগুলো তাতে গড়িয়ে পড়ে। কে আছে যে পবিত্র কুরআনের অসম্মান করতে পারে? কিন্তু উক্ত ঘটনার মাধ্যমে তাদের তাকওয়া ও বিশ্বস্ততার স্বরূপ খুব ভালোভাবে উন্মোচিত হয়ে গেছে। যে আয়াতের ওপর তাঁর রক্ত পড়ে তা একটি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা নিজ সময়ে এমন মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে যে, চরম পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তিও সেই রক্তমাখা অক্ষরগুলোর ঝলক দেখে ভয়ে নিজের চোখ বন্ধ করে নিবে। সেই আয়াতটি হলো فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (সূরা বাকারা: ১৩৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে তোমার প্রতিশোধ নিবেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। এরপর সুদান নামের আরেক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাঁর ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। প্রথম আঘাত করলে তিনি (রা.) হাত দিয়ে তা প্রতিহত করেন, ফলে তাঁর হাত কেটে যায়। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, খোদা তা'লার কসম! এটি সেই হাত যা সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ লিখেছিল। এরপর সে দ্বিতীয়বার আঘাত করে তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তাঁর স্ত্রী নায়লা সেখানে আসেন এবং তাদের দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়ান, কিন্তু সেই পাষাণ একজন নারীকে আঘাত করতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি, বরং সে আঘাত হেনেই ক্ষান্ত হয়। এর ফলে তাঁর স্ত্রীর আঙুল কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর সে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আরেকটি আঘাত করে এবং তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করে। আঘাতের যন্ত্রণায় যখন তিনি (রা.) অচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রচণ্ড ব্যাথায় ছটফট করছিলেন, তখন সেই পাষণ্ড এটি ভেবে যে, এখনও তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয় নি, হয়ত প্রাণে বেঁচে যাবেন, তাঁর গলা চেপে ধরে টিপতে থাকে আর ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাঁর গলা ছাড়ে নি যতক্ষণ না তাঁর প্রাণ-পাখি জড়দেহ ছেড়ে উড়ে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করেছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী প্রথমে আকস্মিক এই ঘটনার ভয়াবহতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কিছু বলতে পারেন নি, কিন্তু অবশেষে তিনি চিৎকার করেন। এতে দরজায় প্রহরারত লোকেরা ভিতরে ছুটে আসেন, কিন্তু তখন সাহায্যের কোন মূল্য ছিল না আর যা হবার তা হয়ে গেয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর একজন মুক্ত কৃতদাস সেই ঘাতক

সুদানের হাতে রক্তে রঞ্জিত তরবারি দেখে আর সহ্য করতে পারেন নি, তাই সে সামনে এগিয়ে গিয়ে তরবারি দিয়ে সেই ব্যক্তির শিরোশ্ছেদ করে ফেলে। এটি দেখে তার সাথীদের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। এখন ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহাসন খলীফাশূন্য হয়ে গেছে। তাই মদিনাবাসী অধিক চেষ্টা করাকে বৃথা কাজ মনে করে আর সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যায়। হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করার পর এসব লোক নিপীড়নের হাত গৃহের অন্যদের ওপরও প্রসারিত করতে শুরু করে। হযরত উসমান (রা.)-এর সহধর্মিণী সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রস্থানের সময় তাদের মধ্যে থেকে এক হতভাগা তাঁর সম্পর্কে তার দোসরদের কাছে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় মন্তব্য করে। একজন লজ্জাশীল মানুষের জন্য, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, একথা মেনে নেয়াও নিঃসন্দেহে অসম্ভব যে, মহানবী (সা.)-এর একজন অন্যতম প্রবীণ-জ্যেষ্ঠ ও অগ্রণী সাহাবী, তাঁর জামাতা, গোটা মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিপতি, যুগ খলীফাকে তারা তখনই কেবল হত্যা করেছিল (এমতাবস্থায়) তারা এহেন নোংরা চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ করতে পারে! কিন্তু এদের নির্লজ্জতা এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোন কুকর্মই তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এরা কোন সদুদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায় নি আর তাদের দলটিও কোন পূণ্যবানদের দল ছিল না। তাদের মধ্যে কতিপয় লোক ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা ইহুদির প্রহসনের শিকার এবং তার ইসলাম-বিরোধী অদ্ভুত সব শিক্ষামালার ভক্ত। এছাড়া কতক ছিল কঠোর সমাজতন্ত্রবাদী বরং (বলা উচিত) বলশেভিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। আর কিছু ছিল সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী, যারা তাদের দীর্ঘলালিত শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে চাইত। আবার কেউ কেউ ছিল দস্যু ও ডাকাত, যারা এই নৈরাজ্যের মাঝে নিজেদের উন্নতির পথ সন্ধান করত। অতএব তাদের নির্লজ্জতা বিস্মিত হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়, বরং এরা যদি এমন আচরণ না করত তাহলে সেটিই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। তারা যখন লুটপাট করছিল তখন আরেকজন মুক্ত কৃতদাস হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ির লোকদের চিৎকার ও আর্তনাদ শুনে সহ্য করতে পারে নি। তাই সে প্রথমে আক্রমণ করে সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে যে প্রথম কৃতদাসকে হত্যা করেছিল। এজন্য তারা তাকেও হত্যা করে এবং মহিলাদের শরীর থেকেও অলংকারাদি খুলে নেয় আর হাসিঠাট্টা করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উক্ত হত্যাকারীদের বর্বরতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, তারা নিজেরা কী করেছে? হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করেছে আর তিনি যখন রক্তের মাঝে ছটফট করছিলেন তখন হত্যাকারী হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করছিল। তার দেহ সম্পর্কে মন্তব্য করছিল। এরপর তারা এর চেয়েও জঘন্য কাজ করেছে, অর্থাৎ কেবল হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী-ই নয়, বরং তার চেয়েও তারা (আরো এক ধাপ) এগিয়ে গিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কেও তারা নোংরামি করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এসব কথা শোনার পর আমি এটিই বলব যে, খোদা তা'লা আমাকে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন আর এজন্য আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু আমার মন চায়, হায়! আমি যদি এখনকার চেয়ে তখন থাকতাম তাহলে আমি তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। তিনি (রা.) বলেন, তাদের চরম ধৃষ্টতা দেখুন? তারা হযরত আয়েশা (রা.)-কে তাঁর পর্দা সরিয়ে দেখার পর বলেছে, ইনি তো যুবতী। হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকেও বিরত হয় নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা থেকেও এটিই বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে তিনি কখনো ভীত হন নি, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) এ বিষয়ে কখনো ভীত হন নি যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে। ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত যে, মদিনার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর নামাযের পূর্বে বিদ্রোহীরা সকল মসজিদে ছড়িয়ে পড়ত এবং মদিনাবাসীকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখত যাতে তারা একত্রিত হয়ে তাদের

মোকাবিলা করতে না পারে। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল ও নৈরাজ্য সত্ত্বেও হযরত উসমান (রা.) নামায পড়ার জন্য একাই মসজিদে যেতেন এবং সামান্য ভয়ও তিনি অনুভব করতেন না। ততদিন পর্যন্ত তিনি নিয়মিত আসতে থাকেন যতদিন না লোকেরা তাকে নিষেধ করেছে। যখন নৈরাজের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে নৈরাজ্যবাদিরা আক্রমণ করে বসে, তখন সাহাবীদেরকে তিনি (রা.) নিজ গৃহের আশপাশে প্রহরায় নিয়োজিত না করে বরং তাদেরকে কসম দিয়ে বলেছেন, তারা যেন তাঁকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে হুমকি কবলিত না করে এবং নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়। যে ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করতে ভয় পায়, সে কি এমনটি করতে পারে আর মানুষকে একথা বলতে পারে যে, আমার কথা চিন্তা করো না, বরং নিজ নিজ গৃহে চলে যাও! এটি প্রমাণিত যে, শাহাদাত বরণের ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)-এর কোন ভীতি ছিল না। যেভাবে খুতবার শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এসব ঘটনায় হযরত উসমান যে বিন্দুমাত্রও ভীত ছিলেন না; এর আরেকটি জোরালো প্রমাণ হলো, এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে আসেন এবং সিরিয়ায় ফেরৎ যাওয়ার সময় মদীনাতে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করেন, আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন, সেখানে আপনি এসব নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকবেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, হে মুয়াবিয়া! আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সান্নিধ্যের ওপর অন্য কিছুকেই প্রাধান্য দিতে পারি না। এ প্রেক্ষিতে তিনি নিবেদন করেন, আপনি যদি (আমার) একথা মানতে রাজি না থাকেন তাহলে আমি সিরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি দল আপনার নিরাপত্তার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। হযরত উসমান (রা.) বলেন, নিজের নিরাপত্তার জন্য একটি সেনাদল রেখে মুসলমানদের রিযিক আমি সংকুচিত করতে চাই না। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মানুষ আপনাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করবে, অথবা আপনার বিরুদ্ধে তারা রীতিমতো যুদ্ধও আরম্ভ করতে পারে। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না। আমার জন্য আমার খোদাই যথেষ্ট। অবশেষে তিনি বলেন, আপনি যদি অন্য কিছুর অনুমোদন না দেন তাহলে কমপক্ষে এতটুকু করুন যে, দুষ্টলোকেরা যেসব জ্যেষ্ঠ সাহাবী সম্পর্কে দম্ভ ভরে মনে করে যে, আপনার পর তারা সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারবে আর তাদের নাম নিয়ে নিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে, আপনি তাদের সবাইকে মদিনা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিন এবং বাহিরের দেশ সমূহে ছড়িয়ে দিন। এতে দুষ্টদের চক্রান্ত দুর্বল হয়ে যাবে আর তারা ভাববে, আপনার সাথে বিবাদ করে তাদের কী লাভ যেখানে মদিনায় দায়িত্ব গ্রহণের মতো আর কেউ-ই নেই! কিন্তু হযরত উসমান এই প্রস্তাবও গ্রহণ করেন নি, (পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে) এবং বলেন এটি কীভাবে হতে পারে যে, যাদেরকে মহানবী (সা.) একত্রিত করেছেন, আমি তাদেরকে দেশান্তরিত করব। হযরত মুআবিয়া একথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, আপনি যদি আর কিছু না-ই করেন তাহলে এতটুকুই ঘোষণা করে দিন যে, আমার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে মুআবিয়া। তিনি বলেন, হে মুআবিয়া! তোমার প্রকৃতি কঠোর। আমি ভয় পাই যে, তুমি আবার কোথাও মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা না কর। তাই আমি এই ঘোষণাও করতে পারব না। বলা হয়ে থাকে যে, হযরত উসমান দুর্বলচিত্ত ছিলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই বল, এরূপ সাহসিকতা কতজন দেখাতে পারবে? উক্ত ঘটনাবলীর বর্তমানে কি একথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর হৃদয়ে কোন ভীতি ছিল? অর্থাৎ হযরত উসমানের হৃদয়ে কোন ভীতি ছিল? যদি ভয় থাকত তাহলে তিনি বলতেন, তুমি তোমার সেনাবাহিনীর একটি দল আমার সুরক্ষার জন্য পাঠিয়ে দাও। তাদের বেতনভাতার ব্যবস্থা আমি করব। যদি ভয় থাকত তাহলে তিনি ঘোষণা করতেন যে, আমার ওপর যদি কেউ হাত উঠায় তাহলে সে জেনে রাখুক আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে মুআবিয়া। কিন্তু তিনি এছাড়া আর কোন উত্তর দেন নি

যে, হে মুআবিয়া! তোমার প্রকৃতি কঠোর, আমি ভয় পাই যে, আমি যদি তোমাকে এই অধিকার প্রদান করি তাহলে তুমি মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা করবে। অবশেষে যখন শত্রুরা দেয়াল টপকে তাঁর ওপর আক্রমণ করে তখন কোন ভয় বা ভীতি প্রদর্শন না করে তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকেন। একপর্যায়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর এক পুত্র, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি করুণা করুন, অগ্রসর হয় এবং হযরত উসমান (রা.)-এর শ্মশ্রু ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দেয়। হযরত উসমান তার দিকে চোখ তুলে তাকান এবং বলেন, হে আমার ভাতুষ্পুত্র! এখন যদি তোমার পিতা জীবিত থাকতেন তাহলে তুমি কখনো এরূপ করতে না। একথা শুনতেই তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠে এবং সে লজ্জিত হয়ে ফিরে যায়। এরপর অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং সে একটি লোহার শিক দিয়ে, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমানের মাথায় আঘাত করে আর সামনে যে কুরআন রাখা ছিল, সেটিকে পা দিয়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়। সে সরে গেলে অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং তরবারি দ্বারা তাঁকে (রা.) শহীদ করে। এসব ঘটনা দৃষ্টে কে বলতে পারে যে, হযরত উসমান (রা.) এসব ঘটনায় ভীত ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন হয়েছে, আর তিনি সেভাবেই আগমন করেছেন যেভাবে হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত দাঊদ, হযরত সোলায়মান এবং অন্যান্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তাঁর পরও সেভাবেই খিলাফতের ধারা আরম্ভ হয়েছে যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের পর খিলাফতের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা যদি বিবেকের চোখে দেখি এবং এর বাস্তবতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করি তাহলে আমরা জানতে পারব যে, এটি এক মহান ব্যবস্থা। অর্থাৎ খিলাফত ব্যবস্থা এক মহান ধারা। বরং আমি বলব, যদি দশ হাজার প্রজন্মও এর প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করা হয় তথাপি তা কোন মূল্য রাখে না। আমি অন্যদের সম্পর্কে জানি না, কিন্তু অন্ততপক্ষে নিজের সম্পর্কে জানি যে, মহানবী (সা.)-এর যুগের ইতিহাস পাঠের পর আমি যখন হযরত উসমানের ওপর আপতিত বিপদাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেই আর অপরদিকে সেই জ্যোতি ও আধ্যাত্মিকতাকে দেখি, যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসে তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, তখন আমি বলব, পৃথিবীতে যদি আমার দশ হাজার বংশধর জন্ম নেয়ার হতো, আর সেই নৈরাজ্য দূরীভূত করার জন্য তাদের সবাইকে একত্রিত করে উৎসর্গ করে দেয়া হতো, তাহলে আমি মনে করি এটি উকুনের বিনিময়ে হাতি ক্রয় করার মতো ব্যবসা। অর্থাৎ উকুনের ন্যায় অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে অতি মূল্যবান জিনিস অর্থাৎ হাতি ক্রয় করার মতো একটি বিষয়, বরং তার চেয়েও লাভজনক বিনিময়। আসল কথা হলো, কোন জিনিসের মূল্য কী– তা আমরা পরে অনুধাবন করে থাকি। অর্থাৎ পরবর্তীতে বোঝা যায় যে, প্রকৃত মূল্য কী। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর বুঝা গিয়েছিল যে, খিলাফতের গুরুত্ব কতটা? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

হযরত উমর (রা.)-এর তিরোধানের পর খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি সকল সাহাবীর (রা.) দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের পরামর্শে তিনি এ কাজের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন আর একাধারে তাঁর (সা.) দুই কন্যাকে তার সাথেই বিয়ে দেয়া হয়। মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় কন্যা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, আমার যদি আরো কোন মেয়ে থাকত তাহলে তাকেও আমি হযরত উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম। এ থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মক্কাবাসীদের দৃষ্টিতে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখতেন এবং তৎকালীন আরবের সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমান হওয়ার পর যে কয়জন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য নির্বাচিত করেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত উসমান। আর তাঁর সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ধারণা ভুল ছিল না, বরং স্বল্প কয়েক দিনের

তবলীগেই হযরত উসমান (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর এভাবে তিনি السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ। অর্থাৎ- ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হন যাদের প্রশংসা পবিত্র কুরআনে অতি ঈর্ষণীয় ভাষায় করা হয়েছে। আরবে তিনি কতটা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তার কিছুটা ধারণা এ ঘটনা হতে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) যখন একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে মক্কায় আগমন করেন আর মক্কাবাসীরা বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে তাঁকে (সা.) উমরা করার অনুমতি দেয় নি, তখন মহানবী (সা.) প্রস্তাব রাখেন যে, কোন বিশেষ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে মক্কাবাসীদের নিকট এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হোক এবং এ কাজের জন্য তিনি হযরত উমর (রা.)-কে মনোনীত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মক্কায় যদি কেউ তাদের সাথে আলোচনা করতে পারে তবে তিনি হলেন হযরত উসমান (রা.), কেননা তিনি মানুষের দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। অতএব যদি অন্য কেউ যায় তাহলে এতে ততটা সফলতার আশা করা যায় না যতটা হযরত উসমান (রা.)-এর ক্ষেত্রে করা যায়। আর তাঁর এই কথাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও সঠিক বলে মেনে নেন এবং তাঁকেই উক্ত কাজের জন্য প্রেরণ করেন। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমান (রা.) কাফেরদের দৃষ্টিতেও বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে অনেক সম্মান করতেন। একবার তিনি (সা.) শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) আসেন। তিনি (সা.) সেভাবেই শুয়ে থাকেন। এরপর হযরত উমর (রা.) আসেন। তখনও তিনি (সা.) সেভাবেই শুয়ে থাকেন। তারপর হযরত উসমান (রা.) আসলে তিনি (সা.) দ্রুত নিজের কাপড় গুছিয়ে নেন আর বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর প্রকৃতিতে লজ্জাশীলতা অনেক বেশি, তাই আমি তার আবেগ-অনুভূতির কথা চিন্তা করে এরূপ করি। তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) সেই বিরল ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেও কখনো মদ পান করেন নি এবং ব্যাভিচারের ধারেকাছেও যান নি। এগুলো এমন বৈশিষ্ট্য, যা আরবের মতো দেশে, যেখানে মদ পান করা গর্বের বিষয় আর ব্যাভিচারকে নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক বিষয় মনে করা হতো, ইসলাম ধর্মের পূর্বে গুটিকতক ব্যক্তি ছাড়া (কারো মাঝে) খুব একটা দেখা যেতো না। মোটকথা তিনি (রা.) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, বরং অতি উন্নত মানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। জাগতিক সম্মানের দিক থেকেও তিনি (রা.) অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁর (রা.) প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আর হযরত উমর (রা.) তাঁকে সেই ছয় ব্যক্তির একজন আখ্যায়িত করেছেন যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর উচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তিনি (রা.) **'আশারায়ে মুবাশ্বেরা'**-র একজন ছিলেন, অর্থাৎ সেই দশব্যক্তির একজন, যাদেরকে মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

হযরত উসমানের শাহাদাতের দিন সম্পর্কে বলা হয় যে, হযরত উসমান (রা.) ১৭ অথবা ১৮ যুলহজ্জ তারিখে ৩৫ হিজরী সনে জুমুআর দিন শহীদ হন। আবু উসমান নাহদী-র মতে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত তাশরীক-এর দিনগুলোর মধ্যম দিনে হয়েছিল; অর্থাৎ ১২ যুলহজ্জ তারিখে। অপরদিকে ইবনে ইসহাকের মতে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার এগারো বছর এগারো মাস বাইশ দিন পর এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর তিরোধানের পঁচিশ বছর পর ঘটেছিল। অপর একটি বর্ণনা অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন উসমান বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা.) জুমুআর দিন ১৮ যুলহজ্জ তারিখে ৩৬ হিজরী সনে আসরের নামাযের পর বিরাশি বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন। শাহাদাতের সময় তিনি (রা.) রোযাদার ছিলেন। আবু মা'শার-এর মতে শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর। হযরত উসমান (রা.)-এর কাফন-দাফন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, নিয়ার বিন মুকরাম বলেন, শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী

সময়ে আমরা চার ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.)-এর মরদেহ বহন করি। অর্থাৎ আমি, যুবায়ের বিন মুতআম, হাকীম বিন হিযাম এবং আবু জুহুম বিন হুযায়ফা। হযরত যুবায়ের বিন মুতআম তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মুয়াবিয়া এর সত্যায়ন করেছেন। উক্ত চারজনই তাঁর কবরে নেমেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের বিন মুতআম ষোলজন ব্যক্তিকে নিয়ে হযরত উসমান (রা.) এর জানাযা পড়িয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ এর ভাষ্য হলো, প্রথম রেওয়ায়েতটি বেশি সঠিক। অর্থাৎ চার ব্যক্তি সম্পর্কিত রেওয়ায়েত; যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, চার ব্যক্তি তাঁর জানাযার নামায পড়েছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন উসমান বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.)-কে শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে 'হাশ-এ-কাওকাব' এ দাফন করা হয়। রবী' বিন মালেক নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারা নিজেদের মৃতদেরকে 'হাশ-এ-কাওকাব' এ দাফন করবে। 'হাশ' ছোট বাগানকে বলা হয় আর 'কাওকাব' ছিল একজন আনসারী-র নাম, যিনি উক্ত বাগানের মালিক ছিলেন। এটি জান্নাতুল বাকী-র অতি নিকটবর্তী একটি স্থান ছিল। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বলতেন, শীঘ্রই একজন পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এবং তাকে সেখানে দাফন করা হবে; অর্থাৎ 'হাশ-এ-কাওকাব'-এ দাফন করা হবে, আর মানুষ তার অনুসরণ করবে। মালেক বিন আবু আমের বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যাকে সেখানে দাফন করা হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর দাফন সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এটিও পাওয়া যায় যে, নৈরাজ্যবাদী ও বিদ্রোহীরা তিনদিন পর্যন্ত তাঁর লাশ দাফন করতে দেয় নি। অতএব তাবরীর ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, আবু বশীর আবেদী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.)-এর মরদেহ তিনদিন পর্যন্ত কাফন-দাফনবিহীন ছিল এবং তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন করতে দেয়া হয় নি। এরপর হযরত হাকীম বিন হিযাম ও হযরত জুবায়ের বিন মুতআম হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর দাফনের ব্যাপারে কথা বলেন, যেন তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর পরিবারের নিকট তাঁর দাফনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতএব হযরত আলী (রা.) তা-ই করেন আর তারা হযরত আলী (রা)-কে অনুমতি প্রদান করেন। যখন তারা অর্থাৎ বিদ্রোহীরা এ কথা জানতে পারে তখন তারা পাথর নিয়ে রাস্তায় বসে পড়ে। এদিকে হযরত উসমান (রা.)-এর জানাযার সাথে তার পরিবারের কয়েকজন বের হয়। তারা মদিনায় একটি বেড়াঘেরা স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা রাখতেন যাকে 'হাশ-এ-কাওকাব' বলা হতো। ইহুদিরা সেখানে নিজেদের মৃতদের দাফন করত। হযরত উসমান (রা.)-এর জানাযা যখন বাইরে আসে তখন তারা (অর্থাৎ বিদ্রোহীরা) তাঁর খাটিয়াতে পাথর ছুঁড়তে থাকে আর তাঁকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। যখন হযরত আলী (রা.)-এর কাছে উক্ত সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাদের প্রতি বার্তা প্রেরণ করেন যেন তারা এমন করা থেকে বিরত হয়। এতে তারা বিরত হয়। অতঃপর জানাযা বা শবদেহ যাত্রা করে। অবশেষে হযরত উসমান (রা.)-কে 'হাশ-এ-কাওকাব'-এ দাফন করা হয়। আমীর মুআবিয়া যখন মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন তখন তিনি আদেশ দেন যেন এ ঘেরা দেয়া স্থানের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়, যাতে তা জান্নাতুল বাকী-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর তিনি মানুষকে আদেশ দেন যেন তারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের হযরত উসমান (রা.)-এর কবরের চারপাশে দাফন করে। এর ফলে সেই অঞ্চল মুসলমানদের কবরস্থানের সাথে গিয়ে একীভূত হয়ে যায়। ইতিহাসের কতক গ্রন্থে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সেই জায়গা স্বয়ং হযরত উসমান (রা.) ক্রয় করে জান্নাতুল বাকী-র সাথে যুক্ত করেছিলেন। যাহোক স্মৃতিচারণের কিছু অংশ এখনও বাকি আছে যা আগামীতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজ আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির জানাযার নামাযও পড়াব, তাই এখন তাদেরও স্মৃতিচারণ করছি।

প্রথমে যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে তিনি হলেন, মৌলভী মুহাম্মদ ইদ্রিস তেরো সাহেব, মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আইভরি কোস্ট- যিনি কয়েকদিনের অসুস্থতার পর গত ২৭ ও ২৮ তারিখের মধ্যরাতে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি আইভরি কোস্টের নাগরিক ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি বুরকিনাফাসো চলে যান। জাগতিক পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ষাটের দশকে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাকিস্তানে চলে যান আর সেখানে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা সমাপনান্তে আইভরি কোস্টে মুবাল্লেগ হিসেবে সিলসিলাহ্‌র সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথমে ঘানা এবং পরবর্তীতে বুরকিনাফাসোতে দায়িত্ব পালনের পর পুনরায় ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আইভরি কোস্টে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। পাকিস্তান যাওয়ার যে ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক। তাঁর কাছে সঞ্চিত অর্থ-কড়ি যা-ই ছিল, তা দিয়ে তিনি প্লেনের টিকিট ক্রয় করেন আর কাউকে কিছু না জানিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছে যান, অর্থাৎ আইভরি কোস্ট জামা'তকেও বলেন নি আর পাকিস্তানের কাউকেও অবগত করেন নি। পাকিস্তানে পৌঁছে এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। হঠাৎ দেখেন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছে যান, বরং সেই ব্যক্তি স্বয়ং তাঁর কাছে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন আর কোথায় যাবেন? তিনি ইংরেজী ভাষা জানতেন না আর উর্দূও জানতেন না, দু'একটি আরবী বাক্যে কথা হয়। যাহোক, তিনি তাকে আহমদীয়া হলে নিয়ে আসেন। এরপর সেই ব্যক্তি বলেন, আমার স্ত্রী রাতে স্বপ্নে দেখেছে যে, একজন ভিনদেশী অতিথি এসেছে আর আপনি তাকে নিয়ে এসেছেন। তাই (স্ত্রীর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে) আমি এয়ারপোর্টে এসেছি আর যখন দেখলাম উড়োজাহাজ থেকে বেরিয়ে কেবল আপনিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন আমি বুঝে গেলাম, ইনিই সেই অতিথি যাকে আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখেছেন। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (রাবওয়াতে আসার) জন্য বন্দোবস্ত করে দেন। এই ঘটনাটি তিনি প্রায়ই শুনাতেন আর বলতেন যে, আমি সারা পথ দোয়া করতে থাকি আর তখনও আমি দোয়ায় রত ছিলাম। এটি দোয়া কবুলিয়্যতের নিদর্শন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সকল ব্যবস্থা নিজেই করেছেন আর এক রাত পূর্বে করাচিতে বসবাসরত ঐ আহমদী ব্যক্তির স্ত্রীকেও স্বপ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমি আসছি। অতএব এভাবে তার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আহমদীয়া হলে পৌঁছে যান আর পরবর্তীতে রাবওয়া পৌঁছেন। মোটকথা তিনি খুবই পুণ্যবান এবং দোয়াগো ব্যক্তি ছিলেন।

আইভরি কোস্টের মিশনারী ইনচার্য জনাব কাইয়ূম পাশা সাহেব জানিয়েছেন যে, বুরকিনাফাসোতে আমরা একসাথে তিন বছর কাজ করেছি। এছাড়া আইভরি কোস্টেও একত্রে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। জামা'তের প্রতি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তিনি অশেষ ভালোবাসা রাখতেন। খুবই আত্মত্যাগী, ইবাদতকারী মানুষ ছিলেন। উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং মানুষকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করতেন। অন্যের শিশুদের নিজ ঘরে রেখে তাদের পড়াশুনা এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতেন। ধর্ম সেবার ক্ষেত্রে সর্বদা সম্মুখ সারিতে থাকতেন। অতিথি আপ্যায়ন তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ পরিচিতি ছিল। তবলীগের রীতিও অতি চমৎকার ছিল আর গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এছাড়া মানুষ তাঁর তবলীগ পছন্দ করত। যেখানেই তবলীগের উদ্দেশ্যে বসতেন সেখানেই তাঁর আশপাশে মানুষের ভিড় জমে যেত। তিনি তাহাজ্জুদ গুযার এবং সত্য স্বপ্নদর্শী ও নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন।

আইভরি কোস্টের মুয়াল্লেম সিদ্দিক জিয়ালু সাহেব বলেন, মৌলভী ইদ্রিস তেরো সাহেব জামা'ত এবং খিলাফতের জন্য দিওয়ানা ছিলেন যিনি সদা-সর্বদা জামাতের স্বার্থে

সবরকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি বলেন, আমি আইভরি কোস্টে আর কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে বেশি জামা'তকে ভালোবাসতে দেখিনি। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হতো, আপনি কোন দেশের নাগরিক? তখন উত্তরে বলতেন, আমি আফ্রিকানও নই, ইউরোপিয়ানও নই, অন্য কোন দেশের নাগরিকও নই; আমার জাতীয়তা, আমার পরিচয় ও আমার জাতি হলো আহমদীয়াত! তিনি আইভরি কোস্টের প্রারম্ভিক আহমদীদের মাঝে অন্যতম ছিলেন। আইভরি কোস্টের মুবাল্লেগ বাসেত সাহেব লিখেন, সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জোরালো নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আমি যে কল্যাণই লাভ করেছি, তা খিলাফতের বদৌলতেই লাভ করেছি। জ্ঞানের দিক থেকেও অনেক উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। তার মাতৃভাষা 'জুলা' ছাড়াও ফ্রেঞ্চ, আরবী ও উর্দূ ভাষায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা রাখতেন। ধর্মশাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ ও তার্কিক ছিলেন। ওয়াহাবী আলেমদের সাথে (ধর্মীয়) বিতর্ক করতেন। সান পেদ্রোতে সংঘটিত (এমনই) একটি বিতর্কের ঘটনা একজন আহমদী ভাই আব্দুল্লাহ্ সাহেব শুনিয়েছেন যে, ওয়াহাবী মসজিদে আসেন এবং বিতর্কের জন্য শর্ত নির্ধারিত হয় যে, যুক্তি-প্রমাণ কেবল কুরআন থেকে উপস্থাপন করতে হবে। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত একনাগাড়ে বিতর্ক চলতে থাকে, যার মধ্যে কেবল নামাযের বিরতি দেয়া হয়। বিতর্ক চলাকালে মৌলভী (ইদ্রিস) সাহেব বিরুদ্ধপক্ষের মৌলভী সাহেবের সামনে এমন যুক্তি উপস্থাপন করেন, যার কোন খণ্ডন সেই মৌলভী উপস্থাপন করতে পারেন নি এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেয়; আর সেই বিতর্কে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করে। তিনি আরও লিখেন, তার অবস্থা ছিল লাইব্রেরির মতো; তবলীগের ময়দানে বিভিন্ন রেফারেন্স তার মুখস্থ থাকত, আর সেই রেফারেন্স উর্দূ, আরবী বা ফ্রেঞ্চ– যে ভাষাতেই হোক, তিনি ঝটপট শুনিয়ে দিতেন। সবসময় দোয়াকে নিজের অস্ত্ররূপে ধারণ করতেন এবং সবাইকে দোয়া করার উপদেশও প্রদান করতেন। তার একজন স্ত্রী, চার কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদেরও জামা'তের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয় করুন এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তাদেরকে জামাতের অঙ্গীভূত করুন। জামা'তের সাথে তাদের খুব একটা সম্পর্ক নেই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মোকাররমা আমিনা নায়েগা কায়রে সাহেবার, যিনি উগান্ডার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মুহাম্মদ আলী কায়রে সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন; গত ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। একজন বিনয়ী, শিক্ষিত ও সাহসী নারী ছিলেন। তার স্বামী কায়রে সাহেব বলেন, আমার সফল মুরব্বী হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ কারণ আমার স্ত্রীও বটে। জাতীয়তায় উগান্ডান হলেও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল উনিশ বছর। তিনি তখন কুরআন শরীফ পড়তে পারতেন না; কিন্তু যেহেতু এর জন্য তার মাঝে স্পৃহা ও একাগ্রতা ছিল, তাই তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শিখে ফেলেন এবং এর অর্থে অভিনিবেশ করার চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন পদে থেকে তিনি জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০০৫ সালে তাকে সদর লাজনা নিযুক্ত করা হয়। তবলীগের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। দু'একবার বিনা অপরাধে তাকে কারাবরণও করতে হয়েছে; অর্থাৎ তিনি কোন অপরাধ করেন নি, অন্যায়ভাবে তাকে কারাবরণে বাধ্য করা হয়। তরবিয়তী বিষয়াদিতে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অ-আহমদীদের আপত্তিসমূহের উত্তর দিতেন। তার মেয়ে বলেন, তিনি সুস্থ থাকুন বা অসুস্থ হোন– সর্বাবস্থায় যথাযথভাবে নামায আদায় করতেন। প্রত্যেক বছর রমজান মাসে ই'তিকাফে বসতেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ সহ্য করতেন, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে কোন কিছু সহ্য করতেন না। রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন পর্যায়েও তিনি

কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও ছয় সন্তান রেখে গিয়েছেন, যাদের মধ্যে দুই পুত্র মিশনারী।

পরবর্তী জানাযা সিরিয়ার মোকাররম নূহী কাযাক সাহেবের, যিনি গত ১০ ডিসেম্বর তারিখে আটচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে ১৯২৮ সালে (ঠিক তখন) যখন মওলানা জালালুদ্দীন শাম্‌স সাহেব দামেস্ক থেকে হায়ফা গিয়েছিলেন। হায়ফার প্রথম আহমদী মোকাররম রশিদ বাকিস বুসতি সাহেবের তবলীগে মরহুমের প্রপিতামহ আলী সালেহ্ কাযক সাহেব এবং তার ভাই জর্দানের প্রাক্তন আমীর তাহা কাযক সাহেবের পিতা মুহম্মদ কাযক সাহেব তাদের পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের পরিবার হিজরত করে দামেস্ক চলে যায়। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। নিয়মিত রোযা রাখতেন এবং নামাযী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদাদাতা এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা রাখতেন। জামা'তের কাজে অগ্রগামী থাকতেন এবং নিজের দারিদ্রতা সত্ত্বেও অন্যদের আর্থিক সাহায্য করতেন। অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। মরহুম তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে দুই স্ত্রী এবং তিনজন নাবালিকা (কন্যা) রেখে গিয়েছেন, যার মধ্যে দুই জন ওয়াকফে-নও।

জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওয়াসীম মুহাম্মদ সাহেব লিখেন, তার দায়িত্ব ছিল বিশেষত অসুস্থ ও আহতদের হাসপাতালে পৌঁছানো। সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতেও যখনই তাকে কাজের কথা বলা হতো, তিনি খুবই সাহসিকতার সাথে কাজ করতেন। একইভাবে মজলিসে আমেলার সদস্যদের সফরে নিয়ে যেতেন। তাকে গাড়ি দেয়া হয়েছিল, (যার মাধ্যমে) তিনি এই কাজ করতেন। যখনই বলা হতো, তৎক্ষনাৎ পৌঁছে যেতেন এবং হাস্যবদনে সেবা করতেন। আন্তরিক উদ্দীপনার সাথে সকল কাজ করতেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন আর শেষ কয়েক বছর এই অভ্যাস আরো সুদৃঢ় হয়েছিল। আহমদীদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। তিনি লিখেন, সরলতা, স্বল্পভাষিতা, নিষ্ঠা, মানবসেবা এবং নিয়্যতের স্বচ্ছতার নিরিখে মরহুম সবার ওপর উত্তম প্রভাব রেখে গিয়েছেন।

মরহুমের স্ত্রী খাদিজা আলী সাহেবা লিখেন, আমার স্বামী আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। জনসেবামূলক কাজ তার খুব পছন্দ ছিল। ঘরের কাজে আমাকে সাহায্য করতেন। নিজ কন্যাদের অনেক ভালোবাসতেন এবং তাদের উত্তম তরবিয়তের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তাদের সাথে বসে দীর্ঘক্ষণ জামা'তের ব্যাপারে কথা বলতেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তিনি তার শেষ সময়টাও জামা'তের সেবায় অতিবাহিত করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন।

তার খালাতো ভাই আকরাম সালমান সাহেব, যিনি মরহুমের মাধ্যমে বয়আত করেছিলেন, তিনি লিখেন, আমরা বয়আতের পূর্বেও মরহুমের উত্তম চরিত্রের সাক্ষী ছিলাম। তার নিজেরই আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি তার দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করতেন। তিনি বলেন একটি ঘটনা, যা আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছিল, তা হলো, একবার তিনি অনেক ভালো একটি চাকরি পান। যার মাধ্যমে তার সকল ধার পরিশোধ হয়ে যায়। এরপর তিনি সঞ্চয় করার পরিবর্তে আমার দরিদ্র খালাদের বড় অংকের অর্থ দান করে দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, যেহেতু আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে এবং আমার ওপর কোন ঋণের বোঝা নেই, অতএব আমি ধনী। তাই আমি আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের দান করতে চাই আর দান করাই উচিত। এই কথা আমার কাছে বিস্ময়কর ছিল, কেননা আমি আমার জীবনে এরূপ স্বল্পে তুষ্টি এবং আর্থিক কুরবানীর এই মান কারো মাঝে দেখি নি। তিনি বলেন, আমাদের দুই ভাইয়ের বয়াতের পর আমাদের তালিম, তরবিয়ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। আমাদের খিলাফতের বরকত সমৃদ্ধ

ঈমানোদ্দিপক ঘটনা শুনাতেন। যার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে।

মরহুমের ভাই মু'তায কাযাক সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার শিক্ষক, তিনি লিখেন, আমার মরহুম ভাই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং খিলাফতের প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। যদিও আমাদের পূর্ব-পুরুষ আহমদী ছিলেন, কিন্তু আমরা আহমদীয়াত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমার ভাই খিযির কাযাক সাহেবের জানাযায় অংশ নিতে হালব থেকে দামেস্ক যান, যেখানে কিছু আহমদী ভাইয়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় আর জামা'তের বিষয়ে তার মতবিনিময় হয়। ফিরে আসার পর আমি দেখেছি, তিনি সিজদায় অনেক বেশি কাঁদতেন। এই আকস্মিক পরিবর্তন আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছিল। আমি যখন এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করি, তিনি তখন আমাকে জামা'তের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, এরপর আমি গবেষণা আরম্ভ করি। শুরুতে আমি কেবল নামসর্বস্ব আহমদী ছিলাম। এরপর নিয়মিত জামা'তের শিক্ষা সম্পর্কে পড়ালেখা আরম্ভ করি এবং একটি স্বপ্ন দেখার পর আমি পুনরায় বয়আত করি। আমার বয়আতের ক্ষেত্রে আমার ভাইয়ের নেক পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। দ্বিতীয়বার বয়আতের অর্থা হলো তাদের বংশে শুরু থেকেই প্রথাগত আহমদীয়াত চলে আসছিল, কিন্তু কার্যত তারা আহমদী ছিলেন না। এজন্য তিনি বুঝার পর পুনরায় বয়আত করেন। মরহুম তবলীগ-পাগল মানুষ ছিলেন। যুগ-খলীফার জন্য অনেক দোয়া করতেন। ওসীয়্যতকারী ছিলেন। মরহুম মৃত্যুর পূর্বেই তার মৃত্যু আসন্ন বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বেই তার মা এবং স্ত্রীদের কাছে এর উল্লেখ করেছিলেন।

পরবর্তী জানাযা রাবওয়া নিবাসী মোকাররমা ফরহাত নাসিম সাহেবার- যিনি মোকাররম মুহম্মদ ইব্রাহীম হানিফ ওরফে মাস্টার চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৬ ডিসেম্বর তারিখে ৮৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমার পিতা গুরুদাসপুর জেলার লোধী নাঙ্গাল নিবাসী হযরত মিয়া ইলম দ্বীন সাহেব এবং দাদা হযরত মিয়া কুতুবুদ্দিন সাহেব ছিলেন। তারা মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। মরহুমা অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। নিয়মিত নামায আদায়কারী, রোযাদার, তাহাজ্জুদগুযার, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, দোয়াগো, সরল প্রকৃতির এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবান নারী ছিলেন। বিভিন্ন চাঁদার তাহরীকে তিনি সাধ্যমত অংশ নিতেন। বেশ কয়েকবার বিভিন্ন তাহরীকে নিজের গহনা দান করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে, তিন মেয়ে এবং অসংখ্য দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও পৌত্র-পৌত্রী রেখে গেছেন। তার দুই পৌত্র এবং এক ছেলে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে জামা'তের সেবা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং প্রয়াত সবার মর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)